Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

13th March
2018
Special Issue

Vol : VI Issue : XII,13th March, 2018 ফাল্গুন, ১৪২৪,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

ডাঃ হেনরি নর্মাণ বেথুন - এর ১২৮ তম জন্ম বার্ষিকী

এবং

বেথুন ইন্সটিটিউট এর ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে

বিশেষ সংখ্যা

ডাঃ হেনরি নর্মাণ বেথুন - (১৮৯০ - ১৯৩৯)

ডাঃ নর্মাণ বেথুনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানবসেবায় এগিয়ে আসুন

পেলব মুখার্জী - (সভাপতি)

ডাক্তার হেনরী নর্মান বেথুন-এর ১২৮তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সমস্ত মানবতাবাদী মনীষীরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে অবিস্মরণীয় একটি নাম যা আজও সারা পৃথিবী জুড়ে নতুন নতুন মানব প্রেরণার জন্ম দেয়। কানাডায় জন্মগ্রহণ করলেও মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুদূর চীনদেশে ঐতিহাসিক লং মার্চে অংশগ্রহণ করে মানবসেবার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে চিরস্মরণীয় হয়ে বিরাজ করেছেন ডা. হেনরী নর্মাণ বেথুন, পৃথিবীর ইতিহাসে যার কোন বিকল্প আজও দেখা যায়নি। নিজের প্রাণ বিসর্জন করে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের সেবা করতে করতে যে নজির তিনি সৃষ্টি করেছেন। তার কোন বিকল্প ইতিহাস মোটেও পাওয়া যায়নি, এর সাথে সংগতি রেখে Bethune Institutte of Geriatrics Research of Rehabilitation Centre প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজ থেকে ১৩ বছর আগে, আমাদের প্রাক্তন সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা গড়ে তুলেছি এই সংগঠনকে।

১৩ বছর অতিক্রান্ত হলেও নিত্যনূতন পরিকল্পনা করে গরীব নিম্নবিত্তদের মধ্যে মহান বেথুনের আদর্শ অনুসরণ করার স্পৃহা জাগরুক করার প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রতিবছরই মহামতি বেথুনকে স্মরণে রেখে আমরা কিছু না কিছু কাজ করে চলেছি কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী তার সাফল্য এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি কি? বিগত বছর Dr. Norman Bethune Clinic যেখানে অবস্থিত সেখানে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রায় ৪২লক্ষ টাকা খরচ করেছি। আকুপাংচার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছি। Physiotherapy Centre আমরা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেও আশানুরূপ ফললাভ করতে পারছি কি? আমাদের দুর্বলতা আছে ঠিকই কিন্তু আমাদের ভরসা আছে আপনাদের সবার সহযোগিতা ও অকৃপণ দানে আমরা এগিয়ে যেতে সক্ষম হব। সেই অবস্থা আমাদের আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিত্যনূতন নজির সৃষ্টি করে চলেছেন সারা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। আমাদের বিশ্বাস আপনাদের সহযোগিতা পেলে তা আমরাও করতে পারব সহজেই। সেই অনুরোধই আজকের এই শুভ দিনে আপনাদের কাছে করতে চাই। আপনারা এগিয়ে আসুন, গড়ে তুলুন মহান বেথুনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে যেতে।

আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ সবল থেকে এগিয়ে চলুন লক্ষ্য অর্জনের পথে।

—ঃ সম্পাদকের কলামে ঃ—

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ,

আশা করি পরিবার পরিজন সহ সকলে কুশলে আছেন। ১৩ বৎসর পূর্বে ২০০৫ সালের ১৩ই মার্চ ডা নর্মান বেথুনের আদর্শে আমাদের এই সংস্থা বেথুন ইনস্টিটিউট অব্ জেরিয়াট্রিক্স এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কালের অমোঘ বিধানে অনেক সহযোগী বন্ধু প্রয়াত হয়েছেন। প্রয়াত হয়েছে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জী ও শ্রদ্ধেয় হরিদাস মালাকার। এদের প্রত্যেককে আজ আমর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

৩রা মার্চ মহান মানবতাবাদী ডাঃ হেনরী নর্মান বেথুনের জন্মদিন এবং ১৩ই মার্চ আমাদের সংস্থা প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উভয় দিনকে স্মরণ করতে আজ (১৩ই মার্চ, ২০১৮) এখানে আমরা মিলিত হয়েছি। অন্যান বছরের মত এবারেও সংস্থার পক্ষ থেকে কয়েকজন সমাজসেবীকে সম্মান জানানো হবে।

প্রবীণদের শারীরিক ও মানসিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমরা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রতিষ্ঠিত হয়ে ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক। সেখানে আছে একটি উচ্চমানের ফিজিওথেরাপী সেন্টার ও চিকিৎসকদের চেম্বার ২রা মে,ক ২০১৭ থেকে চালু হয়েছে বকুল দত্ত মেমোরিয়াল আকুপাংচার সেন্টার। বাঁশদ্রোণী শাখাকেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা চালু আছে। উভয়কেন্দ্রেই বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" পালিত হয়েছে। ফিজিওথেরাপী ও আকুপাংচার কেন্দ্র আপনাদে দানের অর্থ দিয়েই স্থাপিত হয়েছে। আশা করি সকলের সহযোগিতায় আমরা আমাদের পরবর্তী লক্ষ্যে অর্থা একটি ডিজিটাল এক্সরে ইউনিট স্থাপনে সমর্থ হব।

আগামী ২৪শে মার্চ প্রয়াত বিমল চ্যাটার্জী ও হরিদাস মালাকার-এর স্মরণে আমাদের মূল কেন্দ্রে বিকে পাঁচটায় একটি আলোচনা সভা হবে। আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। প্রয়োজনে চিকিৎসা কেন্দ্রের সুযো নিতে সবাইকে আহ্বান জানাই।

আসুন সবাই মিলে ভাল থাকি, আনন্দে থাকি।

একুশেঃ অতীত থেকে ভবিষ্যৎ

পবিত্র সরকার

'ফেব্রুয়ারি' বলার দরকার হয় না, 'একুশে' বলাই যেন যথেষ্ট। 'একুশে পদক', 'একুশে বইমেলা', 'একুশের শহীদ', 'একুশের দিনগুলি'। 'একুশে' কথাটা আর কোনও এক খ্রিষ্টীয় অব্দের কোনও মাসের কোনও তারিখ বোঝায় না। কথাটা উচ্চারিত হলেই একটি আবেগঘন স্মৃতি, একটি জাতির রক্তাক্ত প্রতিবাদের ধারবাহিকতা, এক স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ওই তারিখটির স্বীকৃতি - পর পর এই ক্রমিক চিত্রনাট্য আমাদের সামনে খুলে যায়। অবশ্যই ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯শে মে তারিখটিও এক বিরল মহত্ব আছে, আছে আমাদের শোকপালন ও শ্রদ্ধার উপর তার দাবি। দক্ষিণ ভারতেও তেলেগু আর তামিলভাষীদের ভাষা-জাতীয়তার লড়াইয়ে বিচ্ছিন্ন আত্মদানের ইতিহাস আছে। তবু একুশে ফেব্রুয়ারী এখন এক আন্তর্জাতিক প্রতীক ও উদ্‌যাপনের দিন। যতদূর জানি, এই উপমহাদেশের বুক থেকে আর কোনোদিন সেভাবে চিহ্নিত হয়নি। ইতিহাস নিয়ে এ লেখায় আমরা কথা বলবো না, কারণ তা হবে পরিচিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আমরা বলবো বর্তমানের কথা, ভবিষ্যতের কথা।

এটা ভাষা নিয়ে, আত্মোৎসর্গের দুই বা তার বেশি দিনের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতার প্রশ্ন নয়। ভাষা, স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের লড়াইয়ে যেখানে যেটুকু জয় অর্জিত হয়েছে তা সমস্ত মানুষের হয়ে জয়, তাতে সমস্ত মানুষের সংগ্রাম মহিমান্বিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিও তাই মানুষের নিজের ভাষায় অধিকারের পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতির দ্বারা চিহ্নিত। এই অধিকারের অনেকগুলি দিক আছে। এক, এবং একেবারে প্রাথমিক হলে এই ভাষায় কথা বলার অধিকার। 'কথা বলা' কথাটারও নানা অর্থ আছে। 'কথা বলা' শুধু নিজের সমাজে নিজের প্রতিবেশে নিজভাষী মানুষের মধ্যে কথা বলা নয়, যদি রাষ্ট্রের ভাষা ভিন্ন হয়, তবু আমার নিজের ভাষাতেই আমি রাষ্ট্রকে আমার কথা শোনাব, রাষ্ট্রকে অনুবাদ করেই হোক বা আমার ভাষা জেনেই হোক, আমার কথা শুনতে হবে। এমনকি পৃথিবীর সর্বোচ্চ মানব সংগঠন রাষ্ট্রসংঘকেও আমার ভাষায় আমার কথা শুনতে হবে। সবাই শোনে কি না জানি না, কিন্তু তা আমার মানবিক অধিকারের অঙ্গ। আমি যে মানুষ, তার প্রমাণ আমি একটি ভাষায় বলতে পারি, সে ভাষা যেমনই হোক। আমার এই ভাষা মানুষের ভাষা, তাই মানুষের অস্তিত্বের সর্বত্র আমার ভাষা স্বীকৃত হবে। প্রয়োজন হলে সব মানুষকে আমার ভাষায় পৌঁছাতে হবে, আমার কথা শুনতে হবে।

আমরা ভাবতেই পারি, কথা বলার অধিকার কার নেই, নিজেদের মধ্যে কথায় বাগড়া দিতে যাচ্ছে কে? কিন্তু একটু যেন ভেবে দেখি আমাদের কথা বলার পরিবেশগুলি কীরকম। আমরা যেখানে কথা বলি সেখানে প্রায়ই অন্যরা থাকে। এই অন্যরা হয়তো শাসক বা বৃহত্তর ভাষাগোষ্ঠী (যেখানে আমরা ভাষা-সংখ্যালঘু) অন্যভাবে আমাদের উপর আধিপত্য করে। কিংবা আমাদের ছোট ভাষা হয়তো সাহিত্যসমৃদ্ধ নয় বলে তারা আমাদের ভাষাকে একটু তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। তাই তারা অনেক সময় আমাদের

কথা বলার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। যেমন ১৯৬০-এর বছরগুলি পর্যন্ত আমেরিকা, যেস স্কুলে সাদা আর কালোদের একসঙ্গে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল (আগে তাদের আলাদা স্কুলে পড় হতো) সেগুলিতে কালো ছেলেরা তাদের নিজেদের ইংরেজিতে - যার নাম **Black Englis Vemacular** বা **BEV-** কথা বললেই কোনও কোনও সাদা শিক্ষক ধমকে উঠতেন। 'এই! কী হচ্ শুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বল্!' ব্যাস্ তাতেই মন্ত্রের মতো কাজ হতো, কালো ছেলে বা মেয়েরা একদম চু করে যেত। পরে কোনও শিক্ষকের কোনও প্রশ্নেই তারা আর মুখ খুলতে চাইত না। কারণ তারা তো সা মধ্যবিত্তের প্রমিত বা স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজি শেখেনি, তারা কী করে সে ভাষায় কথা বলবে? তখন সা শিক্ষকেরা ধরেই নিতেন যে, প্রশ্নের উত্তর যখন দিচ্ছে না, মুখ বুজে থাকছে - তখন এরা বোকা, আদ উত্তরটাই জানে না। ফলে শিক্ষা প্রশাসনে এই ধারণাটাই চালু হয়ে গিয়েছিল, কালো ছেলেমেয়েরা সা ছেলেমেয়েদের তুলনায় নিম্ন মেধাসম্পন্ন।

আমরা এই উপমহাদেশেও এই ধরণের ঘটনার সমান্তরাল ঘটনা দেখিনি বা শুনিনি তা নয় একবার (২০০১ সালে) এই লেখক সাঁওতালি ভাষা অলচিকি লিপিতে লেখা হবে কি না তার কমিশনে অধ্যক্ষ হিসেবে হুগলির এক গ্রামে একটি প্রাথমিক স্কুলে গিয়েছিল। সেখানে বেশ কিছু সাঁওতালের বসবা কিন্তু তাঁদের ছেলেমেয়েরা বাংলা স্কুলে বাংলার মধ্য দিয়েই পড়ে। আমরা হেডমাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞে করেছিলাম, 'আপনি সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের ক্লাসের বাইরে নিজেদের ভাষায় কথা বলতে দেন তো তিনি একটু রসিকতা করে বললেন, 'হ্যাঁ, দিই বইকি! তবে আমি যখন ওরা ওদের ভাষায় ওদের ম কথা বলে তখন জিজ্ঞেস করি, কী রে, তোরা আমাকে গালাগাল দিচ্ছিস না তো?'

ভাবুন একবার ব্যাপারটা। হয়তো এরকম হেডমাষ্টার বা শিক্ষক খুব বেশি নেই। কিন্তু তবু তাঁ এই প্রশ্নের পর সাঁওতাল ছেলেমেয়েয়েরা কি স্কুলে আর নিজেদের মধ্যেও তাদের ভাষায় কথা বল সাহস করবে? এখানে বলে রাখি, 'অলচিকি' একটি লিপি, ভাষা নয়, ভাষাটা আসলে সাঁওতালি। কাজে 'অলচিকি' ভাষা বলে কোনও ভাষা নেই, যেমন গুরুমুখি হলো লিপি, ভাষাটা পাঞ্জাবি। কিন্তু আস কথাটা হলো, কথা বলার গণতান্ত্রিক অধিকারের আর একটা জায়গা হলো আমার শিক্ষায় আমার ভাষা ব্যবহার করার অধিকার। ক্লাসঘরে আমার নিজের ভাষায়, এমনকি উপভাষায় প্রশ্ন করার, উত্তর দেওয়া অধিকার।

পশ্চিমবঙ্গে আর বাংলাদেশেও শুনেছি, 'শুদ্ধ ভাষা' বলতে পারে না বলে অনেক শিক্ষ ছাত্রছাত্রীদের বকুনি দেন। আবার এটাও ঘটনা, অনেক শিক্ষক নিজেরাও 'শুদ্ধ ভাষা বলতে পারেন না এখানে আবার একটা কথাসূত্রে মন্তব্য করি, অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার কোনও নৈতিক মূল্য, অর্থা একটা শুদ্ধ ভাষা, আর - একটা 'অশুদ্ধ' ভাষা - এই তফাৎ স্বীকার করে না। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ভাষা প্রমিত ন বলেই 'অশুদ্ধ' হয়ে যায় না, উপভাষাও অশুদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের কাছে সব ভাষা বা উপভাষাই মর্যাদা দিক থেকে সমান, যেহেতু তারা সম্ভাবনার দিক থেকে সমান। একটা ভাষা বা উপভাষা তথাকথি

'উন্নত' বা 'সমৃদ্ধ' হয় নেহাতই কতকগুলি ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, সেই যোগাযোগ অন্য ভাষা বা উপভাষার ক্ষেত্রে ঘটলে তাও সমান উন্নত হতে পারত। যে সব ছাত্রছাত্রী মান্য বা প্রমিত ভাষা বলতে পারে না, তাদের নিজেদের ভাষা সম্বন্ধে অবজ্ঞা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের অধিকার শিক্ষকের নেই-তাঁর নিজের ভাষা 'শুদ্ধ' কি না সে প্রশ্ন না হয় না তুললাম। ওই কাজটি যেই করলাম, শিশুর মনে তার ঘরের ভাষা (তার প্রথম ভাষা) সম্বন্ধে একটা হীনমন্যতার বোধ তৈরি করে দিলাম। সে তখন সেটা লুকোতে চাইবে, চুপ করে যেতে চাইবে - সেই কালো ছেলেমেয়েদের মতো। সে তখন বোকা বলে চিহ্নিত হবে। এটা তার অপরাধ নয়, আমাদের অপরাধ।

কারণ, আমরা কখনও তাকে বলিনি যে, তার জন্মভাষায় যদি তার সবটা পড়ার ব্যবস্থা না করতে পারি, তবে অন্তত তাকে বলতে পারি যে, ক্লাসে তার ভাষায় বা উপভাষায় সে প্রশ্ন করতেই পারে, উত্তর দিতেই পারে। তার ঘরের ভাষা নিয়ে তার লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই, আমরা নিজেরাও যেন তার নিজের ভাষা উপভাষাকে তার লজ্জিত করে তোলার দায়িত্ব না নিই। তার পরে তাকে বোঝাতে হবে যে, তার ভাষা উপভাষাকে আমরা এই শিক্ষাব্যবস্থায় কিছুটা গ্রহণ করতে পেরেছি। কিন্তু তাকে লেখায় বা পড়ে বলার ক্ষেত্রে আরও একটি ভাষারূপ শিখতে হবে, তাতে আমরাই তাকে সাহায্য করবো। এইভাবে আস্তে আস্তে সে এক উপভাষা থেকে আর এক উপভাষায়, হয়তো আর এক ভাষায় পৌঁছে যাবে, নিজের ভাষা- উপভাষাকে ঘৃণা না করে।

লক্ষ্য করি যে, আমরা শিক্ষা প্রশাসকরা, নেতারা, অভিভাবকেরা ইংরেজি বলা-কওয়া (আর লেখা) শেখানোর উপর যত জোর দিই, উপভাষা-অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের প্রমিত বাংলা (বা প্রমিত অন্য কোনও ভাষা) শেখানোর বিষয়ে তত জোর দিই না। পাঠ্যবই প্রমিত ভাষায় লেখা হয়, আর রেডিওতে প্রমিত ভাষা শোনে - তাই আমরা ভাবি এই ভাবেই তারা প্রমিত বাংলা (বা অন্য কোনও প্রমিত ভাষা) নিজে-নিজেই শিখে যাবে। না শিখলে সেটা তাদের দায়, তারা ক্লাসে বকুনি খাওয়ার জন্য তৈরি থাকুক।

একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাসের পর্যালোচনা নিশ্চয়ই বারবার করতে হবে, উৎসব-উৎযাপনও প্রতি বছর নিশ্চয়ই চলবে, কিন্তু তার মূল শিক্ষাগুলি কবে আমাদের জীবনে সত্য হবে- সে প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। বিশেষত, যখন পৃথিবীর ছোট গোষ্ঠীর দুর্বল ভাষাগুলি দ্রুত মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছে। এই শতাব্দীতেই 'এথনোলগ্' — প্রতিবেদনের একটি হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর ৭১০৫টির মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভাষা মরে যাবে বলে অনুমান। এই মৃত্যুর বিরুদ্ধে একুশে ফেব্রুয়ারী একটা প্রতিরোধ তৈরি করুক। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার দিন হিসাবে।

সৌজন্যে - গণশক্তি (১৭.০২.১৮)

—

—ঃঃ বৃদ্ধজনের সামাজিক দায়বদ্ধতা ঃঃ—

শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জী
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

বৃদ্ধজনেরা সমাজবিচ্ছিন্ন কোন বিশেষ ব্যক্তিত্ব নয়। এটাও মনে করার কোন কারণ নেই সমস্ত বৃদ্ধ লোকই জ্ঞানের খনি। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের উদগম হয় মানুষের শিক্ষা ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞ অর্জিত বুদ্ধির বিকাশের মধ্য দিয়ে। এই ভাবেই মানুষের শিক্ষা ও জ্ঞান পরিণত বয়সে প্রজ্ঞায় রূপ তবে সমাজের উন্নতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি কর্মক্ষম মানুষের যে সৃষ্টিশীল মননশক্তি কাজ এবং উৎপাদনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যে উদ্বৃত্ত মূল্য বা সম্পদ সৃষ্টি হয় সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষে কম বেশি ভূমিকা থাকে এবং যখন তার কর্মশক্তি থাকে না তখন সেই বাড়তি সম্পদেও তার অধিক থেকেই যায় এবং সেটা কারও দয়ার দান নয়। সেই হিসাবেই পরিবারে এবং সমাজে বৃদ্ধদের সমা হওয়া উচিত এবং বার্ধক্যের যন্ত্রণা লাঘবে চেষ্টা করা দরকার।

প্রত্যেকটি মানুষকেই জন্মকাল থেকে জীবনে চারটি স্তর পার হয়ে বার্ধক্যে উপনিত হতে হ এই সমগ্র জীবনকালের প্রত্যেকটি স্তরেই নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করে জীবন সায়াহ্নে এ পৌঁছতে হয়। ব্যক্তি মানুষের জীবন, জীবিকা, খাদ্য, বাসস্থান, পরিধান, চিকিৎসা, শিক্ষা, মানসিক বিনোদ এই যাবতীয় বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে মানুষকে পরিবার পরিজন সমাজ ও রাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিত উপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই ব্যক্তি মানুষের জীবন ধারা সবকিছুই সামাজিক পরিস্থিতি এবং পরিবে নির্ভরশীল। ব্যক্তি মানুষ সর্বদাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কি হলে সে ভাল থাকবে একান্ত ভাবে তাই নিয়ে সে ব্যস্ত থাকে। এখন নিজেকে ভাল রাখতে হলে যেমন পরিবার পরিজনদের সাহায্য ও সহযোগি দরকার এবং এই ক্ষেত্রেও ভোগ ব্যবস্থা পেতে হলে তার উপরও কতগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় অধিকার পেতে হলে তাকে দায়িত্ব পালন করতেই হবে। তেমনি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশে মানুষের সাহায্য পেতে হবে, এই দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে।

অতীতকাল থেকে ব্যক্তি মানুষ যখন প্রথমে মায়ের কোলে পরে পরিবারের তত্ত্বাবধানে তাকে থাকতে হয় এবং এই পরিবারও সমগ্র সমাজের অর্ন্তভুক্ত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব পাল এবং অধিকার ভোগের মধ্য দিয়ে তাকে অগ্রসর হতে হয়েছে। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের বাহিরে যখ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে তখন সেই অসহায় মানুষ তার পরিবারকেও সমাজ এবং রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড় চলে না। আসলে সমগ্র জীবন ধারাটাই তার ভাল মন্দ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিরন্তন একটা নতুন চেতনা সে সমৃদ্ধ হয়। বৃদ্ধজনেরা যখন বার্ধক্যে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করে তখনও তার উদ্দেশ্য থাকা উচিত তার চেতনালব্ধ অভিজ্ঞতাকে পূর্ণতার বিকাশের জন্য।

শৈশবকালে মা-বাবার, দাদু ঠাকুমার ও অন্যান্য আপন জনের স্নেহ মায়া মমতা এবং সংসারের মধ্যে তার প্রাথমিক শিক্ষা ও চেতনার উৎগম হয়। এই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ভবিষ্যত জীবনের রূপরেখার ভিত্তি তৈরী হয়ে যায়। কিশোর বয়সে তার শিক্ষার এবং চেতনা বিকাশের যে স্তর তার পরিবার, আত্মীয় পরিজন সকলের সান্নিধ্য তাকে নতুন জীবনের স্বাদ এনে দেয়। এই শিক্ষা, অভিজ্ঞতা কিশোর মনে একটা অদ্ভুদ অনুভূতি এনে দেয় যা বিকশিত হয়ে সে যৌবনে এলে, যৌবনকালের বিদ্যালয় শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে স্কুলে সহপাঠী, শিক্ষক মহাশয়দের সান্নিধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়তা করে, আর যদি কোনরকম কু-অভ্যাসের দ্বারা সে আক্রান্ত হয় তাহলে তার নতুন নতুন শিক্ষা এবং তৎলব্ধ চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অন্তরায় সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক পক্ষে তার ভবিষ্যতে উচ্চ পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা সমৃদ্ধ হয়, অন্যথায় তার পরবর্তী জীবনে এই ঘাটতি পুরণ হওয়া খুব শক্ত।

যৌবনকাল পর্যন্ত মানুষের এই অবস্থায় যে নতুনস্তর সেক্ষেত্রে শারীরিক শক্তির সঙ্গে মানসিক শক্তির তার সৃষ্টিশীল চেতনা এবং সমাজের সামাজিক উৎপাদনের এই প্রক্রিয়াকালে প্রত্যেকটি স্তরেই দেখা যাবে মানুষের যে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয় তা সমাজ থেকে পাওয়া এবং সমাজকে দেওয়া এই সাংস্কৃতিক বিকাশ তার জীবনকে নতুন স্তরে উদ্দীপ্ত করে। সমস্ত পরিস্থিতি এই শিক্ষাই দেয় মানুষকে উন্নততর জীবনমান আয়ত্ত করতে হয়। পাওয়ার মধ্যেই নয় দেওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজন এবং আগ্রহ এমন স্তরে পৌঁছায় কিনা যখন তার অধিকার ভোগের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব পালনের চেতনার যথাযথ বিকাশ হয়। তার অগ্রগতির পথ সুগম হবে অন্যাথায় যৌবনকাল পার করে দিয়ে প্রৌঢ়ত্বে এসে যাতে তার কর্মশক্তি উন্নত স্তরে পৌঁছতে পারে। অথচ পরিস্থিতির বৈপরিত্য এই সত্যও প্রকাশ করে যে আদিমকালে মানুষ এবং তার সমাজ, শিশু, রুগ্ন, মানুষ এবং অশক্ত বৃদ্ধদের যে দায়িত্ব গ্রহণ করত সভ্যতার বিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষের এই দায়িত্ব বোধ অনু-পরিবার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ম্লান হয়ে, বিস্মৃত হয়ে আপন আপন ব্যক্তি-স্বার্থে নিমগ্ন হয়ে পরছে সভ্যতার বিকাশের এই স্তর এটা মোটেই প্রগতির লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ যোগ্য নয় এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য নিরন্তন সচেষ্ট থাকা দরকার।

প্রবীনত্বে বুদ্ধিদৃপ্ত হলে তাকে আরো এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে অন্যথায় হতাশার নৈরাশ্য স্বাভাবিক ভাবে তাকে পঙ্গু করে তোলে। শরীরের স্বাস্থ্য এবং মন উভয়ই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বুদ্ধির দীপ্ত মানুষের শরীরকে চাঙ্গা রাখে। এই অবস্থায় মধ্যেও প্রায়শই সে সামাজিক কোন সৃষ্টিশীল চিন্তা এবং উৎপাদন ক্ষমতা সে যতই সীমাবদ্ধ হোক, তা তাকে বার্ধক্যের যন্ত্রণা থেকে অনেক খানি উপশম করে। আর যদি সে একান্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যা সে পেয়েছে তার জন্য আনন্দ উপভোগ না করে যা পায়নি সেই না পাওয়ার ব্যাথা, বেদনা হতাশা থাকে আরো পঙ্গু করে দেয়। বার্ধক্যের যন্ত্রণা তার মধ্যে বাসা বাঁধে। আর এই স্তরেও যদি সে পরিবারে, সমাজে রাষ্ট্র আরো কিছু দেওয়ার জন্য নিজেকে আগ্রহান্বিত করে তাহঁলে শতকষ্টের মধ্যে যে প্রশান্তি সে অর্জন করতে পারে তা তার জীবনকে অনেক খানি গ্লানিমুক্ত করে সমুজ্জ্বল করে

তোলে। এই হলো ব্যক্তি মানুষের সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুসরণ এবং প্রশান্তি অর্জনের রূপরেখা। কষ্টসাধ্য হলেও আত্মা সমীক্ষা এবং চেতনার নীরিখে বার্ধক্যেও নতুন নতুন সাফল্যের জন্য এগিয়ে যাওয়া দরকার। বৃদ্ধদের সংগঠন কেবল মাত্র এটা সেটা পাওয়ার জন্যই ব্যস্ত থাকতে পারে না, 'তাকে সমাজের বৃহত্তর পরিধির মধ্যে সৃষ্টিশীল কর্মের মধ্যে বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দিয়ে পরম প্রশান্তিতে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারে, যে জীবনের অধিকারী হয়ে মানুষ একবার শুধু একবারই জন্মগ্রহণ করে।

(পুনঃ মুদ্রিত

—ঃঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০১৮ R.G. Urology & Laparoscopy Hospital এর সহায়তায় অনুষ্ঠিত মেডিক্যাল ক্যাম্প এর রিপোর্ট ঃঃ—

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০১৮ **R.G. Urology & Laparoscopy Hospital** এর সহায়তায় একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত শিবিরে **Height, Weight, BMI, ECG, BMD, PET** এবং **Uroflowmetry** পরীক্ষা করা হয়। সকাল ১১টা থেকে উক্ত পরীক্ষা শিবির শুরু হয়ে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চালু রাখা হয়।

উক্ত শিবিরে মোট ৪৯ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। শিবির পরিচালনার খরচ বাবদ উপস্থিত সদস্যদের নিকট হইতে মোট - ১৩৫১/- টাকা সংগৃহীত হয় এবং শিবির পরিচালনার জন্য মোট ১০৮০/- টাকা খরচ হয়েছে।

তাছাড়া উক্ত হাসপাতাল কতৃপক্ষের সাথে আমাদের আলোচনা হয়েছে তারা আমাদের সাথে টাইআপ করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন। এ ব্যাপারে চিঠি প্রদান করা হবে এবং আমাদের বেথুন ক্লিনিকে ডাক্তার দিয়ে সাহায্য করার ব্যাপারেও যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

—ঃ নর্মান বেথুন — আমাদের প্রেরণা ঃ—

ডাঃ মৃগেন্দ্র নাথ গাঁতাইত

এক দেশের মানুষের সংগ্রামে অন্য দেশের মানুষের সাহায্য ও অংশগ্রহণ হল আন্তর্জাতিকতাবাদ। এই মূল্যবোধের ছোট প্রকাশ হল নিজ পাড়ায়, গ্রামে, অঞ্চলে সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ। একান্তই আত্মকেন্দ্রীক মনোভাব কাটিয়ে নিজের পরিবারের বাইরেও অন্যদের সাহায্য করার মধ্যেই সামগ্রিক সমাজের উন্নয়ন নির্ভর করে। সমাজের প্রতি ব্যক্তি মানুষের কর্তব্য বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিশ্বমানের প্রতি মানুষের সহমর্মিতাকে জন্ম দেয়। এই সহমর্মিতার ফলে মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়েও অপরের কল্যাণে এগিয়ে যায়। তাইতো কবির আহ্বান- 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'।

সুদুর কানাডা থেকে ডাঃ নর্মান বেথুন স্পেনে ও চীনে গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন আরো অনেক মানুষ যাঁদের সচেতন মন মানবিকতার লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে শুধু সোচ্চার হয়নি, তাঁরা সক্রিয় প্রতিরোধে সামিল হয়েছিলেন।

নর্মান বেথুন নিজ চেষ্টায় ডাক্তারি, বিশেষত, শল্য চিকিৎসায় পারদর্শী হয়েছিলেন। তিনি নিজে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরে যক্ষা রোগের চিকিৎসায় বুকের অস্ত্রোপচারের নানা নতুন পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি থোরাসিক সার্জন হিসাবে সেই সময় পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এক সময় বিত্তশালীদের চিকিৎসা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন, কিন্তু পারিপার্শ্বিক মানুষদের দারিদ্র, অপুষ্টি, বাঁচার দুরবস্থা, চিকিৎসা করার অক্ষমতা দেখে তাঁর মন ক্লিষ্ট হত যক্ষা নিরাময় করতে গিয়ে এই রোগের আসল কারণটি জানার জন্য তিনি তাঁর প্রতিভা নিয়োজিত করেন তিনি জানতে পারেন যে এর একমাত্র কারণ দারিদ্র তাঁর সচেতন মন তাই উপলব্ধি করতে পেরেছিল রোগ শুধু দেহের নয়, সমাজের ব্যাধির সঙ্গেও ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। তিনি বুঝেছিলেন প্লেগ যেমন লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনহানি করতে পারে, তেমনি ধনতন্ত্র, মুনাফা, ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের দুর্দশা আনতে পারে, মৃত্যুও ঘটাতে পারে। পরে তিনি লিখেছিলেন 'ব্যক্তিগত আর্থিক মুনাফাকে চিকিৎসা জগৎ থেকে দূর করে লোভে উন্মত্ত ব্যক্তি স্বার্থের কলুষতা থেকে এই পেশাটিকে পরিষ্কার করা হোক, স্বজনের ঘাড় ভেঙ্গে নিজেকে ধনবান করার ব্যাপারটিকে অসম্মানজনক বলেন প্রতিপন্ন করা হোক'। এই বোধ থেকেই তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির আদর্শের অংশীদার হয়েছিলেন এবং নির্দ্ধারণ করে ছিলেন তাঁর জীবনের কর্মক্ষেত্র। তাই ছুটে গেলেন স্পেনে ফ্যাসিবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে যোগ দিতে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে কাজ করার জন্য, আবার গেছেন চীনে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণে পর্যুদস্ত চীনের প্রতিরোধী সংগ্রামী সৈন্য ও সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা করতে।

তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর ছিল ভালবাসা, দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্যপরায়নতা। এই বোধগুলিই তাঁকে উজ্জীবিত করেছে রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাধারণ মানুষের উপযোগী নানা বিকাশ ঘটাতে। তাই স্পেনে গিয়ে তিনি চলমান ব্লাড ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাতে দ্রুত আহতদের রক্ত দেওয়া সম্ভব হয়। আহতদের আসার জন্য অপেক্ষা না করে আহতদের কাছে পৌঁছে যাবার চিন্তা এসেছে বাস্তব ক্ষেত্রে সংগ্রামী মানুষকে সাহায্য করার জন্য - যাতে দ্রুত চিকিৎসা করলে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়। চীনের রণাঙ্গণেও অবরুদ্ধ এলাকায় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের খুব নিকটে চলমান হাসপাতাল নিয়ে পৌঁছে যেতেন। এমনকি চলমান হাসপাতালের জিনিবপত্র নিরাপদে সুষ্ঠভাবে বহন করার জন্য নানা কৌশল তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। অর্থাৎ যে কাজ করতে হবে সেই

কাজকে কতটা ভালভাবে সফলতার সঙ্গে করা যায় তার জন্য সৃজনশীল চেষ্টা করেছেন। ডাঃ বেথুনের স্মরণসভা
মাও সে তুং বলেছিলেন 'কমরেড বেথুন একজন ডাক্তার ছিলেন, চিকিৎসা করাই ছিল তাঁর পেশা। তিনি প্রতি
নিয়তই নিজের দক্ষতার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করতেন। যাঁরা ভিন্নতর কিছু দেখলেই নিজের কাজের পরিবর্ত
এবং যাঁরা টেকনিক্যাল কাজকে অর্থহীন কাজ অথবা ভবিষ্যৎহীন কাজ বলে অবজ্ঞা করেন তাদের জন্যও এ
এক চমৎকার শিক্ষা'। 'ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়' এই আপ্ত বাক্যকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন মানুষের প্রতি
ভালবাসার আন্তরিক ইচ্ছা থেকেই।

বেথুনের মৃত্যু হয়েছিল চীনের রণাঙ্গনে চিকিৎসার অভাবে। কারণ জাপানী ফ্যাসিবাদী অবরোধে সেখা
সামান্য সালফা ওষুধ পাওয়া যায়নি তাঁর সেপ্টি সিমিয়া চিকিৎসার জন্য। তেমনি চীনে মারা গিয়েছিলেন ভারত
থেকে প্রেরিত মেডিক্যাল মিশনের (১৯৩৮-১৯৪৩) সদস্য ডাঃ দ্বারকানাথ শান্তারাম কোটনিস উপযুক্ত চিকিৎস
অভাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেথুনের মৃত্যুর পর বেথুনের স্মৃতিতে তৈরি বেথুন আন্তর্জাতিক শান্তি হাসপাতাল
দায়িত্ব নিয়েছিলেন ডা. কোটনিসক। চীনের হোপেই প্রদেশের রাজধানী সিচিয়াচুয়াং শহরে একই বাড়িতে স্থাপ
হয়েছে বেথুন স্মারক, কোটনিস স্মারক এবং ভারতীয় মেডিকেল মিশন স্মারক প্রদর্শনী কক্ষ। চীনের জন
গভীরভাবে এঁদেরকে স্মরণ করে ও শ্রদ্ধা জানায়।

বেথুনের আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের যে কাজগুলি করা উচিৎ তা হল ঃ

১) আমাদের নিজ নিজ কাজটুকু নিষ্ঠা সহকারে করতে হবে। চিকিৎসক, শিক্ষক, শ্রমিক বা কর্মচ
নিজের কাজটুকু যদি নিষ্ঠা সহকারে করে তাহলেই সামগ্রিকভাবে সমাজের মঙ্গল হবে।

২) আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া উচিৎ সমাজের সাধারণ মানুষের প্রতি মমতাশীল ও দায়িত্বপূর্ণ হওয়া

৩) বড় বড় নেতা হবার চাইতে ছোট ছোট ক্ষেত্রে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ
ছোট নেতৃত্বই যোগফলে অনেক বেশি কাজ সম্পন্ন করে। চিকিৎসক যে হেলথ সেন্টারে বা হাসপাতালে ক
করবেন সেটা যাতে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে ভালভাবে কাজ করে, তাহলেই বৃহত্তর সমাজের মঙ্
হাসপাতালের বা হেলথ সেন্টারের প্রধানকে সৃজনশীলভাবে চেষ্টা করতে হবে কীভাবে সাধারণ মানুষের উপযো
কাজের পরিকল্পনা করা যায়। শুধু উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি নয়, দরকার মানুষের প্রতি দরদ। না হলে যন্ত্রপ
পড়েই থাকবে কোন উপকারে লাগবে না। অনেক কম উপকরণেও অনেক বেশী কাজ করা যায় যদি সাধ
মানুষের প্রতি মমত্ব ও কাজে নিষ্ঠা থাকে। শিক্ষক যেন নিজের স্কুলে বা কলেজের কাজটি ভালভাবে ক
যথাযথ নেতৃত্ব দিয়ে ছাত্রদের গড়ে তোলেন।

৪) সমাজ এবং রাষ্ট্রের ব্যাধিগুলিকে বুঝতে হবে যাতে করে কাজের দৃষ্টিভঙ্গী সঠিকভাবে গড়ে
যায়। নিজের আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেও সমাজের মধ্যে যদি অসাম্য, দারিদ্র থাকে তাহলে আমাদের উচিত
সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা, যাতে সমাজটাতে বৈষম্য, দূরীভূত হয়, তা না হলে মুনাফার প্রকোপে
বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।

লেখক পেশায় চিকিৎসক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডা. বি. কে বসু মেমোরিয়াল রিসার্চ অ্যান্ড
ইনস্টিটিউট অফ আকুপাংচার এর ডিরেক্টর। ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ এর এক সভাপ

উপলব্ধি-১

—ঃ বিচার ঃ—

সুনিত ঘোষ মজুমদার

শিব ঠাকুরের আপন দেশে,
নেইকো কোন বাঁধন, নেইকো কোন শাসন
ভাল মন্দের বিচার করে যে জন,
তার সাথে নেই তর্ক, দ্বন্দ্ব সবার।
আকাশ যদি ভেঙ্গে পড়ে, বাতাস নাশি বয়,
বিচারকের বিচার তবু সঠিক ভাবে হয়।
যে জন ভাবে, আমার চেয়ে, উনি কিসে বড়?
জ্ঞানের থেকে অজ্ঞানতায় সে জন বিশেষ বড়।

উপলব্ধি - ২

-ঃ আলোর জন্ম ঃ-

টেবিলে, কাগজ, পেনসিল, কলম নিয়ে বসেছি
কিছু লিখব বা আঁকবো বলে।
সামনে খোলা আকাশ,
মনের জানালা খোলা, বাতাস আসবে বলে।
কি লিখব, কি আঁকবো, যখন লুকোচুরি খেলে মনে,
হঠাৎই ভাবনা বলে, কবিতায় আছে, ছবি ও গল্প একই সাথে।
আকাশের থেকে রং নিয়ে, বাতাসের গতি নিয়ে,
লিখেছি কবিতা, আঁধারের বুকে আলোর জন্ম নিয়ে।
অসীম যখন, নিবিড় অন্ধকারে ঢাকা,
হয়নি জন্ম আলোর কনার,
বাতাস ছেয়েছে ছোটাছুটি করে, সারা আকাশ।
ডুবেছে আকাশ, ডুবেছে পৃথিবী ঘন কালো রংয়ে,
সে রাতে ছিলনা আকাশে কোন তারা,
দেখায় নি কোন আলো।
আঁধারের রং ছিল গাঢ় কালো।
অসীম থেকে আলোর কণা, আনল অবধূত
আকাশের বুকে আলোর বন্যা, মাটির বুকে দুধ,
লাল, হলুদ রং নিয়ে, গলানো সোনার রূপ নিয়ে,
ঘুচাল আঁধার, বসালো আবার, রং রূপের সংসার।

—ঃ লেলিন ঃ—

গৌতম রায় চৌধুরী

গত ৪ঠা মার্চ, সন্ধ্যায় মনে হল যেন এক অদ্ভুত আঁধার ঘনিয়ে এলো। ত্রিপুরার বিলোনিয়
ভ্লাদিমির ইলিচ লেলিনের মূর্তি বুলডোজারের আঘাতে ভূপাতিত। ৩রা মার্চ ভোটের ফল প্রকাশের প
থেকেই বামপন্থীদের উপর অত্যাচার শুরু হয়ে গেছিল। ভেবেছিলাম গণতান্ত্রিক ভারতের এই বিজ
উৎসব দীর্ঘস্থায়ী হবে না, কিন্তু সমস্ত ধারণা ভুল প্রমাণ করে হানাদারের দল মেতে উঠল হিংস্র উল্লাসে

অনেকেই বলছেন সামান্য একটা মূর্তি, তাও এক বিদেশীর তার ধ্বংসে কী যায় আসে। কি
লেনিন তো কোনো নির্দিষ্ট দেশের নন, তিনি সার্বজনীন। তার মূর্তির উপর আঘাত এক মতাদর্শের উপ
আঘাত। নয়তো বিজয় উৎসবে কী লেনিন মূর্তি ভাঙ্গতে হয়? যেভাবেই হোক একটা দল নির্বাচনে জিতে
যথেষ্ট গরিষ্ঠতা আছে, 'জয় করেও তার ভয় কেন তবে যায় না?'' তবে কী জয় সম্পন্ন হয়নি? নির্বাচ
পরাজয় হয়েছে কিন্তু আদর্শের পরাজয় হয়নি, আদর্শের প্রতিমূর্তিকে তাই সরিয়ে ফেলতে হবে।

ত্রিপুরা বিধানসভায় মাত্র ৬০ জন বিধায়ক লোকসভায় মাত্র ২ জন সদস্য, এর চেয়ে অনেক ব
ড়য় রাজ্যে যেমন মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি জায়গায় নির্বাচনে জিতে এত উল্লাস
আমরা দেখিনি, ত্রিপুরার জয় কেন এত উচ্ছ্বাস? মনে হয় প্রকৃত শত্রুর বিরুদ্ধে এই তাদের প্রথম জয়

পরিণত বয়েসে এসে মনে প্রশ্ন জাগে কেন এর বিরুদ্ধে জনগণ রুখে দাঁড়াতে পারছে না? য
বিলনিয়ায় বুলডোজারে চলছিল তখন হাজার জনতা কেন মানব শৃঙ্খল তৈরি করল না? কিন্তু হাল ছাড়
তো চলবে না। লেনিনের উপর এই আক্রমণ প্রমাণ করে যে পথটা সঠিক। এখানেই লুকিয়ে আছে মতাদ
সংঘাত। তাই এই ধর্মীয় ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে আপাত ভাবে অনেক বড় বড় দল থাকলেও আ
লড়াইটা লড়তে হবে বামপন্থীদেরই। বর্তমান ভারতে বামপন্থীদের দায়িত্ব অনেক বেশি। 'জয় রাম' ধ
তুলে ওরা চরম অন্যায় করতে পারে। কাব্যের রামকে ওরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থেই ব্যবহার করে। রামায়ণ
ইতিহাস বলে চালানোর যে রাজনৈতিক অপপ্রয়াস বেশ কিছুকাল ধরেই শুরু হয়েছে তার খণ্ডন
রবীন্দ্রনাথ বহুদিন আগেই করে রেখেছেন, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন - ''
সমস্ত ইতিহাস'' কে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূ
বলিয়া গণ্য করি, তাই এই দুঃসময়ে বারবার আশ্রয় নিতে হবে আমাদের মণিষীদের কাছে কতদিন অ
অন্নদাশঙ্কর রায় মানস দৃষ্টিতে বিলোনিয়া প্রত্যক্ষ করে লিখেছিলেন —

"লেনিন মূর্তি না বাঁচে তো
গান্ধীও কি বাঁচবে?
গান্ধী মূর্তি ধ্বংস করে
নাচবে ওরা নাচবে"

অন্নদা শঙ্কর তো মার্কসবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন আদ্যন্ত গান্ধীবাদী এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারি। তিনি কিন্তু সঠিক আন্দাজ করেছিলেন গান্ধীমূর্তির কাছেও পৌঁছে যেতে পারে বুলডোজার। তাই সবাইকে নিয়ে মতাদর্শের লড়াই আমাদের করতেই হবে। তাছাড়া আমরা তো কবি সুকান্তের উত্তরসূরী। তাই —

" লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন"

একটা দুটো লেনিন মূর্তি ভেঙ্গে ওদের উদ্দেশ্য কখনোই সফল হবে না, কারণ —

আমার কাছে ছেলেবেলার সেই গল্পই চিরসত্য পৃথিবী আর কমলালেবু এক আকার লেনিনের নাম মৃত্যুঞ্জয় মনুষ্যত্ব"

(সুভাষ)

"লেনিন মূর্তি না বাঁচে তো
গান্ধীও কি বাঁচবে?
গান্ধী মূর্তি ধ্বংস করে
নাচবে ওরা নাচবে"

অন্নদা শঙ্কর তো মার্কসবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন আদ্যন্ত্র গান্ধীবাদী এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারি। তিনি কিন্তু সঠিক আন্দাজ করেছিলেন গান্ধীমূর্তির কাছেও পৌঁছে যেতে পারে বুলডোজার। তাই সবাইকে নিয়ে মতাদর্শের লড়াই আমাদের করতেই হবে। তাছাড়া আমরা তো কবি সুকান্তের উত্তরসূরী। তাই —

" লেনিন ভূমিষ্ট রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন"

একটা দুটো লেনিন মূর্তি ভেঙে ওদের উদ্দেশ্য কখনোই সফল হবে না, কারণ —
আমার কাছে ছেলেবেলার সেই গল্পই চিরসত্য পৃথিবী আর কমলালেবু এক আকার লেনিনের নাম মৃত্যুঞ্জয় মনুষ্যত্ব"

(সুভাষ)

—ঃ বিগত দিনের কাজ ঃ—
২০১৭-১৮

২২শে মার্চ ১৭	ঃ	কমঃ হরিদাস মালাকার এবং কমঃ বিমল চ্যাটার্জী এর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে স্মারক বক্তৃতা
১৫ই এপ্রিল ১৭	ঃ	১লা বৈশাখ মিলনোৎসব।
২রা মে ১৭	ঃ	আকুপাংচার ক্লিনিক উদ্বোধন
৬ই মে ১৭	ঃ	আকুপাংচার বিষয় সেমিনার
৯ই মে ১৭	ঃ	রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী।
২৬শে মে ১৭	ঃ	নজরুল জন্ম জয়ন্তী। (বাঁশদ্রোনী শাখা অফিসে)
২৯শে জুলাই ১৭	ঃ	বার্ষিক সাধারণ সভা
১৪ই অক্টোবর ১৭	ঃ	প্রবীণ নাগরিক দিবস এবং শারদীয় মিলন উৎসব
২১শে জানুয়ারী ১৮	ঃ	স্বাস্থ্য শিবির (ডাঃ নর্মাণ বেথুন ক্লিনিকে)
২রা ফেব্রুয়ারী ১৮	ঃ	পিকনিক।
২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮	ঃ	হৃদমাঝারে (মাতৃ ভাষা দিবস অনুষ্ঠান)
২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮	ঃ	নিওরোলজী ক্যাম্প বেথুনে
২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮	ঃ	মাতৃভাষা দিবস অনুষ্ঠান
১৩ই মার্চ ১৮	ঃ	সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস ও ডাঃ নর্মান বেথুনের জন্ম দিবস

———

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in